আনন্দবাজার পত্রিকা

আনুগত্য আদায়ের ভাষা

‘তরবারি সেথা কোন কাজে লাগে যেখানে সূচের খেলা’

কুমার রাণা

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

ছাপান্ন লক্ষ লোকের দেশ সিঙ্গাপুর। তার মাত্র ৬১ শতাংশ পূর্ণ নাগরিক, বাকিরা কর্মসূত্রে অধিবাসী। বাজার অর্থনীতির স্বর্গ বলে পরিচিত দেশটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক কারণে মালয়কে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দিলেও, তার প্রধান কাজকর্মের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে ইংরেজিকে, আর সরকারি ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছে ইংরেজি, মালয়-সহ চিনা ও তামিলকে। সিঙ্গাপুরের চার হাজার কিলোমিটার দক্ষিণে আশি লক্ষের দেশ পাপুয়া নিউ গিনি, বিশ্বে সর্বাধিক সংখ্যক মাতৃভাষার দেশ (৮৫১); সেখানেও সরকারি ভাষা চার, যার মধ্যে একটি ইংরেজি। জ়িম্বাবোয়েতে সরকারি ভাষা ষোলো, দক্ষিণ আফ্রিকাতে এগারো, দু’দেশেই ইংরেজি সরকারি ভাষাগুলোর একটা। আবার এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কোনও ‘সরকারি ভাষা’ নেই, যেমন মেক্সিকো বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (সেখানে ‘ওনলি ইংলিশ’ আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু প্রতিরুদ্ধ হয়েছে)। আবার ইংরেজি বহু দেশে সরকারি ভাষা হওয়া সত্ত্বেও, ব্রিটেনে তাকে সরকারি ভাষা করা হয়নি, সেখানে ওয়েলশ হচ্ছে একমাত্র সরকারি ভাষা। সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষিত হোক বা না হোক এই সব দেশ— এবং অন্য বহু দেশ— বহুভাষিকতাকে বিশেষ মূল্য দিয়ে থাকে। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে অন্যের ভাষাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভারতীয় সংবিধান এবং স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও বিশ্বের এই ধারাটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে শুরু করে। হিন্দি ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে মানা হলেও, প্রথমে ষোলো, এবং পরে আরও ছয় যোগ করে মোট বাইশটি ভাষাকে অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই

ভাষাগুলো রাজ্য স্তরে সরকারি ভাষার মর্যাদা পায়। জনগণনায় মাতৃভাষার হিসেব নেওয়ার সময় যে ব্যক্তি— পরিবার নয়, ব্যক্তি— যেটিকে তাঁর মাতৃভাষা বলে চিহ্নিত করবেন গণনাকারীকে সেটাই লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোনও কারণেই এর ব্যত্যয় চলবে না, গণনাকারী এ-ক্ষেত্রে নিজের মত বা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারবেন না। অর্থাৎ মাতৃভাষা চিহ্নিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব পাচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীন ভূমিকা। এ-ভাবে হিসেব নিতে গিয়ে ২০১১'র জনগণনায় প্রাথমিক ভাবে ১৯,৫৬৯ ভাষা লিপিবদ্ধ হয়। এদের মধ্যে দশ হাজার বা তার বেশি লোক কথা বলেন এমন মাতৃভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭০, এদের ১২১ হচ্ছে ২২টি অষ্টম তফসিলের তালিকায়, ৯৯টি তাদের গোষ্ঠীভুক্ত। যথা, কেবল হিন্দির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভোজপুরী, মগহি, বুন্দেলখণ্ডী, ছত্তীসগঢ়ী ও হিন্দি-সহ ৫৬টি মাতৃভাষা।

সংখ্যার বিচারে হিন্দি ভারতের সর্ববৃহৎ ভাষা— ২০১১'র জনগণনা ৪৪ শতাংশ লোককে হিন্দিভাষী বলে দেখাচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি মাতৃভাষী গোষ্ঠী বাদ দিলে হিন্দির ভাগ কমে দাঁড়ায় ২৬ শতাংশে। তার পরেও অবশ্য বৃহত্তম ভাষা হিসেবে হিন্দির স্থান পাকাপোক্ত, দ্বিতীয় বৃহত্তম বাংলার চেয়ে বিস্তর এগিয়ে। যদি বিপুল জনসংখ্যা সম্পন্ন ভোজপুরী, রাজস্থানী, ছত্তীসগঢ়ী, হরিয়ানভি, মগহি বা খোটার মতো হিন্দি গোষ্ঠীভুক্ত অন্য কোনও ভাষা অষ্টম তফসিলে জায়গা করে নেয়, যেমনটা করেছে মৈথিলী, তা হলেও হিন্দির সংখ্যা-প্রাধান্য বজায় থাকতে বাধা নেই।

প্রসঙ্গত, অষ্টম তফসিলভুক্ত হওয়ার মানক হিসেবে যে হেতু ভাষাবিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পায় জাতিসত্তাগত আবেগের রাজনীতি, অদূর ভবিষ্যতে অন্য হিন্দি ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত আরও অনেক মাতৃভাষাই অষ্টম তফসিলের ভাষা হিসেবে স্থান করে নিতে পারে। ভারতীয় গণতন্ত্রের নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও দেশের রূপকাররা সংখ্যাকে নয়, প্রাধান্য দিয়েছিলেন এক দিকে ইতিহাস ও অন্য দিকে ব্যক্তি ও জনগোষ্ঠীর মর্যাদাকে। এই চিন্তার ধারা বেয়ে ভারতীয় সংবিধান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্রহণশীলতার সুযোগের কারণে সংখ্যায় নগণ্য হয়েও (মাত্র চব্বিশ হাজার মাতৃভাষী) সংস্কৃত অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত। একই ভাবে এসেছে বড়ো, মণিপুরী, সিন্ধি বা ডোগরি (যথাক্রমে ১৫, ১৭, ২২ ও ২৫ লক্ষ মাতৃভাষী)। ভাষা মানুষের অবিচ্ছেদ্য জৈব-মানসিক সত্তা, নিজের মনকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারাটা, সে যে বেঁচে আছে সেই অনুভবের পূর্বশর্ত। ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দাবি ব্যক্তিসত্তার দাবি। সেই দাবিতে ভারতের অপর গোষ্ঠীগুলোর এগোবার সম্ভাবনা পুরো মাত্রায় বজায় আছে। হিন্দি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মাতৃভাষীরা ছাড়াও কুর্মালি তুলু

কামতাপুরী মুণ্ডারী কুরুখ-সহ বহু গোষ্ঠী অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলে আসছেন। তাঁদের দাবিটা ভারতের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সংবিধানের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত বহুত্বের স্বীকৃতি ও বৈচিত্রের বিকাশের পথরেখা ধরেই নানা ভাষাগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যের দাবি ওঠে, উঠতে পারে।

হিন্দির একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক উদ্যোগের পিছনে আসল কারণ মনে হয় এটাই। তিনি মুখে 'বিদেশি' ভাষার অনুপ্রবেশ রোধের জন্য হিন্দিকে দেশের একমাত্র ভাষা করতে বললেও আসল উদ্দেশ্য হয়তো নানা জনগোষ্ঠীকে আনুগত্যের পাঠ দেওয়া। তাঁদের চাপিয়ে দেওয়া একত্বের রাজনীতিতে নৃগোষ্ঠীগত, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক বহুত্বের স্থান নেই। ভাষিক বহুত্ব এগুলো থেকে আলাদা নয়। তাই, যে কারণে তাঁরা সংবিধান ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভেঙে চলেছেন, সেই কারণেই 'হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান'-এর উদ্যোগ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেও জানেন বিদেশি ভাষা বর্জন সম্ভব নয়। 'দেশ কি এক হি ভাষা হো জিসকে কারণ বিদেশি ভাষাওঁকো জগহ ন মিলে'— তাঁর এই বাক্যেই জগহ শব্দটি ফারসি থেকে নেওয়া। হিন্দি ভাষার ভাণ্ডারে 'বিদেশি' ফারসি-আরবি-তুর্কি-পর্তুগিজ-ইংরেজির কাছ থেকে নেওয়া বিপুল শব্দ-ঋণ। আবার অসীম ভাষা-বিশ্বে ইংরেজি তার কার্যকারিতার জোরে যে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে তাকে প্রতিরোধের চিন্তা আত্মহননের নামান্তর। সজনীকান্ত দাস ১৯৪৯ সালে বলেছিলেন, 'কর্তারা ইংরেজী ছাড়িতে চাহিলেও ইংরেজী চলিবে, নিবর্তকেরা বৃথা হাস্যাস্পদ হইবেন।' কথাটা আজ আরও প্রাসঙ্গিক। বহু দেশ মরণপণ সংগ্রাম করে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু তারা নিজেদের ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিকেও কাজের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। স্মরণ করুন ক্যারিবীয় কবি ডেরেক ওয়ালকটের কবিতা 'আ ফার ক্রাই ফ্রম আফ্রিকা', যেখানে এক দিকে 'মাতাল ব্রিটিশ প্রভু', অন্য দিকে 'ইংরেজি জবান যাকে আমি ভালবাসি'।

ভারতীয় সংবিধান হিন্দিকে 'জাতীয় ভাষা' বা 'একমাত্র ভাষা' হিসেবে নয়, কাজের ভাষা হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেছিল। কিন্তু হিন্দিকে সেই সম্ভাব্যতায় পৌঁছতে গেলে রাষ্ট্রকে যে দায়িত্ব পালন করতে হত তা সে করেনি— ভারতের সাক্ষরতার মানচিত্রে মলিনতম এলাকাটি হল বিস্তৃত হিন্দি অঞ্চল। ১৯৪৯-এ, সজনীকান্তের চোখে, 'হিন্দীর অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল... মধ্যযুগীয় কবিদের বাদ দিলে ইহার সাহিত্যিক মর্যাদা নগণ্য।' আজও এ অবস্থার খুব ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায় না। ক্ষমতার জোরে একটা ভাষাকে সরকারি সিলমোহর দিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রগাঢ় অনুশীলন ছাড়া তাকে প্রকৃত কাজের হিসেবে বিকশিত করে তোলা যায় না। তামিল ধ্রুপদী ভাষা, আবার

বাংলা হিন্দির মতো নবীন হওয়া সত্ত্বেও নানা সংহতির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিশ্ববিদ্যাচর্চার যোগ্য করে তুলেছে। হিন্দিরও সেই যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তার জন্য গোড়ার যে কাজ— হিন্দি অঞ্চলে শিক্ষার বিকাশ— সে কাজটা না করে ক্ষমতার বাগাড়ম্বর দিয়ে, রাষ্ট্রের কৃত্রিম মহিমা প্রচার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসলে অন্য ভাষাগুলোকে যেমন দলন করতে চাইছেন, তেমনই হিন্দিরও বিপুল ক্ষতি ডেকে আনছেন। জাতীয় বা সরকারি ভাষা ছাড়াই যে বিশ্ব সফল ভাবে এগিয়ে যেতে পারে, সেই বিশ্ব থেকে কিছু না শিখে, হিন্দির মতো সম্ভাবনাময় ভাষাকে তিনি আসলে রিক্ত করার মন্ত্রণা দিচ্ছেন।

সংস্কৃত অভিধানে ভাষণের অর্থ বলা হচ্ছে ‘কথন’, আর ভাষার অর্থ ‘অর্থবহ কথন’। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণটা ভিন্ন ভাবে অর্থবহ— আনুগত্য আদায়ের হুমকি হিসেবে। সেই হুমকির প্রত্যুত্তরে ‘কথন’ নয়, আমরা স্মরণ করব সজনীকান্ত যে মধ্যযুগীয় হিন্দি কবিদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন তাঁদের অগ্রণী আব্দুর রহিম খানখানানের দু’টি পঙ্‌ক্তি: রহিমন দেখি বড়েন কো লঘু ন দিজিয়ে ডারি/ জহাঁ কাম আবৈ সুই, কহা করৈ তরবারি (বৃহৎকে দেখে কোরো না রহিম ক্ষুদ্রকে হেলাফেলা/তরবারি সেথা কোন কাজে লাগে যেখানে সূচের খেলা)। ভাষা অতি সূক্ষ্ম, মানবচেতনার সূচিকর্ম, তরবারি দিয়ে তার মুণ্ডচ্ছেদের বাসনাকে দুষ্কামনা ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়?